তারিখ: ২১/১০/২০০০
পৃষ্ঠা: ৪ : ১

ভোরের কাগজ

311

পাবলিক পরীক্ষা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণত পাবলিক পরীক্ষা হয়। ডিগ্রি পরীক্ষায় এক বিষয়ে কোনো পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে পরবর্তী বছর ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে পূর্বে প্রদত্ত পরীক্ষার অন্যান্য পাস করা নম্বর যোগ করে উত্তীর্ণের বিভাগ দেওয়া হয়। কিন্তু বোর্ডে কোনো পরীক্ষার্থী এক বিষয়ে ফেল করলে পরবর্তী বছর ঐ এক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে বিশেষ পাস ঘোষাণা করা হয় এবং বিভাগ উন্নয়নের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। পূর্বে এক বিষয়ে ফেল করলে ফল প্রকাশের প্রায় তিন মাসের মধ্যে কম্পার্টমেন্টাল / রেফার্ড পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর তিন মাস অপেক্ষা করতে হতো। এখন নতুন নিয়মে অপেক্ষা করতে হয় এক বছর। নিয়ম করা হয় সাধারণত সংশ্লিষ্টদের মঙ্গলের জন্য। পূর্বের তুলনায় বর্তমান নিয়মে মঙ্গল কম হচ্ছে- এ যেন পিছন দিক যাওয়ার প্রবণতা। তাছাড়া এক দেশে দুই নিয়ম এটাও অসঙ্গতই মনে হয়। যারা দুটি সনদপত্র (এসএসসি ও এইচএসসি) অর্জন করছে তাদের জন্য শিথিল নিয়ম। যারা একটা সনদপত্রই অর্জন করতে পারেনি তাদের জন্য কঠিন এ নিয়ম যেন দুর্বলের প্রতি অবিচারের শামিল।

ডিগ্রি পরীক্ষা এক বিষয়ে ফেল করলে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডি শন দেওয়া হয়, সেই পদ্ধতিতে যেন বোর্ডের পরীক্ষার্থীকেও ডিভিশন দেওয়া এবং ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় এক বিষয় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীকেও যাতে এ সুযোগ দেওয়া হয়- সেই দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোর্ড যদিও দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়তো একটা- নিয়ম তো অভিন্ন হওয়া উচিত। তা ছাড়া বোর্ডের বিতর্কিত বা অসময়োচিত সিদ্ধান্তের ফলে এসএসসিতে তুলনামূলকভাবে ২০০০ সালে গণিতে ফেল করেছে বেশি। এজন্য পরীক্ষার্থীকে শাস্তি পেতে হবে এটা কাম্য নয়। উত্তরপত্র পরীক্ষক মূল্যায়ন করেন এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এর ব্যক্তিক্রম হবে না এ কথা বোর্ড হলফ করে বলতে পারে না বা কভার পৃষ্ঠা ছাড়া ভিতরের পৃষ্ঠা সরানো বা স্থানান্তরিত হয়নি তাও বোর্ড নিশ্চিত করে বলতে পারে না। কোনো কোনো সময় পরীক্ষার্থী মাঝখানে ভুলে দুই পৃষ্ঠা উল্টে উত্তর লিখছে- পরীক্ষক মাঝখানে সাদা পৃষ্ঠা দেখে পরবর্তী উত্তর মূল্যায়ন নাও করতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত খাতা (উত্তরপত্র) সংযোজন করলে তাও খোয়া যেতে পারে- মূল খাতায় যা উল্লেখ থাকে। এ ছাড়া খাতা মূল্যায়নের পূর্বে হারিয়েও যেতে পারে। এ সন্দেহ দূর করার জন্য উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের সময় পরীক্ষার্থীকে খাতা দেখানোর সুযোগ থাকা প্রয়োজন। এটা হলে কোনো পরীক্ষকই অন্যের দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সাহস পাবেন না। উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীকে না দেখালে কতো নম্বর প্রশ্নের উত্তরে কতো নম্বর পেয়েছে এরকম সকল উত্তরের নম্বর উল্লেখ করে এবং মোট নম্বর আবেদনকারীকে জানিয়ে দেওয়া ভালো। এটা সম্ভব না হলে স্কুল-কলেজের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাক-নির্বাচনী এবং নির্বাচনী ফলের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে নম্বর দেওয়া যায় কিনা ভাবা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহ করলে উত্তরপত্র না দেখালে বোর্ডেরও জবাবদিহিতায় সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। পাবলিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা এসএসসিতে হয়। নৈর্ব্যক্তিক অংশে পুনঃনিরীক্ষণের নিয়ম নেই। কোনো পরীক্ষার্থী নৈর্ব্যক্তিক ৪১ পেলে কম্পিউটারের অপারেটরের ভুলে সে তুলেননি। এ নিশ্চয়তা কে দেবে? এজন্য নৈর্ব্যক্তিক অংশের পুন:নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এ রকম হলে পরীক্ষার্থীকে আজীবন বিশেষ পাস সনদ নিয়ে সমাজে, পরিবারে এবং কর্মজীবনে অনুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ অবস্থায় দিনযাপন করতে হবে। আমার বক্তব্য পরীক্ষার্থীদের মঙ্গলার্থে সক্রিয়ভাবে ভেবে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রাখছি।

খান কমিমুল্লাহ
উপাধ্যক্ষ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।